'স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যৎ'

রঞ্জন কুমার রায়*

প্রেসিডেন্সী কলেজে ছাত্র হিসেবে প্রবেশের দিন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত অনেকগুলি বছর গড়িয়ে গেছে। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই সেদিনের কৈশোর-উত্তীর্ণ ছাত্র আজ বয়স, অবস্থান, দৃষ্টিভঙ্গী ও অভিজ্ঞতায় অনেকখানি পরিবর্তিত। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতও অনেকটাই বদলে গেছে। তাই আজকের প্রেসিডেন্সী কলেজ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগকে যেমন দেখছি সেদিনের দেখা স্বভাবতই ছিল অন্যরকম। প্রত্যক্ষভাবে তুলনামূলক আলোচনা করতে বসা বা অতীতের সবই ছিল ভাল এ জাতীয় কোন পূর্ব ধারণাকে কিন্তু আমার মন প্রশ্রয় দিতে চাইছে না। তবে, আমার ছাত্রজীবন থেকে বর্তমান স্থিতি পর্যন্ত এই কলেজের, এই বিভাগের বহু স্মরণীয় ঘটনার আমি সাক্ষী। বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিতি লাভের সুযোগ ঘটেছে এখানেই। তাঁদের অনেকেই আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, অনেকে শিক্ষক না হয়েও সম্মানের পাত্র।

১৯৭৫ সালের আগষ্ট মাসে প্রথম বিভাগে উচ্চতর মাধ্যমিক (একাদশ শ্রেণী) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর একটি বেশ কঠিন নির্বাচনী পরীক্ষার বাধা অতিক্রম করে তবেই এই কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাম্মানিক ছাত্র হিসাবে প্রবেশাধিকার লাভ করি। যতদূর জানা আছে, সেই সময় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ না হলে এখানে প্রবেশাধিকার পাওয়া যেত না। গুরুজন ও পরিচিতদের কাছ থেকে এই কলেজের ঐতিহ্য সম্পর্কে কিছুটা আভাস নিয়েই এখানে আসা। এবং এসে দেখলাম সে ধারণা অনেকাংশেই সত্য। কলেজের বিরাট বিরাট বাড়ীগুলো, সবুজ মখমলের মত ঘাসে মোড়া মাঠ প্রথম দর্শনেই মনকে টেনে নিয়েছিল। কিছুটা সংশয় তো ছিলই, পারবো তো নিজেকে এই প্রতিষ্ঠানের যোগ্য করে তুলতে। কিছুটা ভয়ও যে ছিল না তা নয়, কারণ আমি শুনেছিলাম যে প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রছাত্রীরা সকলেই অভিজাত ও বিত্তশালী পরিবার থেকে আসে। সেখানে আমি ছিলাম অতি সাধারণ ঘরের ছেলে। কিন্তু আমার এই হীনমন্যতা দূর করে দিয়েছিলেন আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকরা। সাম্মানিক বিষয় ছাড়াও আমাদের অন্যান্য বিষয় পড়তে হত এবং নিয়মিত ক্লাস হত। যেমন, মাতৃভাষা, বাধ্যতামূলক ইংরাজী সাহিত্য, তাছাড়া অতিরিক্ত আর একটি বিষয়। এই বিষয়গুলির আকর্ষণও আমার কাছে যথেষ্টই ছিল। আমার সহপাঠী সহপাঠিনী-দের ব্যাপক প্রবণতা ছিল 'পাস' ক্লাস না করা অথবা কৌশলে উপস্থিতি নথিভুক্ত করে পালিয়ে যাওয়া। কলেজের পুরানো বাড়ীর দোতলায় ২৩নং ঘরে আমাদের বাংলা ও ইংরাজী সাহিত্যের ক্লাস হত। ক্লাস পালানোর মানসিকতা কোনদিনই আমার মধ্যে কাজ করেনি বলেই প্রতিটি ক্লাসেই আমি নিজের উপস্থিতিকে বাধ্যতামূলক কর্তব্য বলে মনে করতাম। এই কারণেই ঐচ্ছিক বিষয়ের সমস্ত অধ্যাপকই আমার নাম জানতেন এবং স্নেহ করতেন। এঁদের কয়েকজন আজ প্রয়াত – কেউ কেউ স্থানান্তরে কর্মরত। যাঁদের কাছে পড়েছি প্রত্যেককেই মনে আছে। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বলি। একদিন আমাদের বিভাগের অধ্যাপক ডঃ অরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের একটি অতিরিক্ত ক্লাস নেন। ফলে, ঠিক পরবর্তী 'পাস' ক্লাসটিতে উপস্থিত হতে আমার কিছু দেরী হয়। এসে দেখি ক্লাসে কেউ নেই। সংশ্লিষ্ট অধ্যাপকের কাছে যেতে তিনি জানালেন যে মাত্র তিনজন উপস্থিত থাকায় ক্লাস হতে পারেনি, তিনি তাদের উপস্থিতি নথিভুক্ত করে ছেড়ে দিয়েছেন। তারপর তিনি ক্ষুব্ধভাবে আমাকে বললেন যে এইভাবে ক্লাস না হলে পরবর্তীকালে নির্দিষ্টসংখ্যক প্রয়োজনীয় উপস্থিতির অভাবে পরীক্ষা দিতে অসুবিধা হবে। তখন তাঁর কাছে এলে তিনি কিন্তু বিবেচনা নাও করতে পারেন। আমি বিনীতভাবে তাঁকে আমার দেরী হওয়ার কারণ জানাই এবং এও বলি যে পরবর্তী সবকটি ক্লাসে অনুপস্থিত থাকলেও আমার কোন অসুবিধা হবে না কারণ আমার উপস্থিতি ১০০%। কাজেই, এ অভিযোগ আমার ক্ষেত্রে ভিত্তিহীন। তিনি খাতা খুলে আমার উক্তির সত্যতা যাচাই করে বিস্মিত হন এবং আমাকে উপস্থিত হিসাবে গণ্য করেন। তারপর তিনি আমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করেন এবং যথাযথ উত্তর পেয়ে সন্তুষ্ট মনে আমাকে বিদায় দেন। আর কোনদিন তাঁর কাছে গেলে তিনি কখনো সংশয় প্রকাশ করেন নি।

ডক্টর নির্মলচন্দ্র বসুরায়চৌধুরী ছিলেন আমাদের বিভাগীয় প্রধান। কত যত্ন নিয়ে পড়াতেন সেটা আজ নিজে অধ্যাপনা করতে গিয়ে বুঝতে পারি। পাঠ্যপুস্তক

---

* প্রাক্তন ছাত্র ১৯৭৫-৮০ (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

ছাড়া বাইরের বই এমনকি গল্পের বই পড়তে প্রবল উৎসাহ দিতেন। সমাজতত্ত্ব পড়াতেন, সেইসঙ্গে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি ও পরিকল্পনা। ভারতীয় সমাজে নারীর মর্যাদা এ বিষয়ে ওঁর কাছে একদিন বুঝতে গেছি। হঠাৎই প্রশ্ন করলেন আমি আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' পড়েছি কিনা ? আমার উত্তর ইতিবাচক হওয়ায় কত সহজে বিষয়টি আমায় বুঝিয়ে দিলেন। পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গ লোকসেবা আয়োগের সদস্য হয়ে উনি চলে যান ১৯৭৯ সালে। কর্মসূত্রে প্রবাসে থাকাকালীন (১৯৮৫) হঠাৎই একদিন খবর পাই – নির্মলবাবু লোকান্তরিত। তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা ১৯৮৩-র এপ্রিল মাসে।

আমার কলেজ ছাত্রজীবনের শুরু থেকে বর্তমানে এই কলেজে অধ্যাপনারত অবস্থা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে। বিভিন্ন সময় মোটামুটিভাবে তিন রকমের আলোচনাসভা এই বিভাগে হত। প্রথমতঃ বিদেশী বা অন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিবর্গের বক্তৃতাকেন্দ্রিক, দ্বিতীয়তঃ বিভাগের অধ্যাপকবর্গের বক্তৃতাকেন্দ্রিক এবং তৃতীয়তঃ ছাত্রছাত্রীদের বক্তৃতাকেন্দ্রিক। ছাত্রাবস্থায় ১৯৮০ সালে আমি এইরকম একটি বক্তৃতা দিই। বিষয় ছিল "Changing Indian Society and the Backward."। তখন বিভাগীয় প্রধান ছিলেন আমাদের শ্রদ্ধেয় ছাত্রদরদী অধ্যাপক ডক্টর অমলকুমার মুখোপাধ্যায়। আমি এই বিভাগে অধ্যাপক-রূপে যোগদান করার পর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর উপর আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে যথাক্রমে ১৪ জানুয়ারী ১৯৮৯ এবং ২ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯ তারিখে। এছাড়া, এই বিভাগের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হিসাবে ত্রিশ বছরের আয়ুষ্কালের মধ্যে তিনটি পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৯৮৩, ১৯৮৫ এবং ১৯৯০ সালে। এর স্মারকপত্রিকাগুলি আমাদের বিভাগে ও গ্রন্থাগারে আছে। অনেক উল্লেখযোগ্য তথ্য এগুলি থেকে পাওয়া যাবে যা হবে পরবর্তীকালের কাছে ইতিহাস।

একটু বর্তমান এবং সেই আলোকে ভবিষ্যতের দিকে ভালো করে তাকানো যাক। বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা ভালই, তবে বেশ কিছু পরিবর্তন দেখছি। সমমনস্কতা এবং ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসে গঠনমূলক কিছু করার ব্যাপারটা যেন কেবল রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাতেই সীমাবদ্ধ। নইলে বিভাগের নিজস্ব অনুষ্ঠানে কেবল মুষ্টিমেয় ছাত্রছাত্রীর ঐকান্তিক চেষ্টা চোখে পড়বে কেন ? আমরা তো এমন ছিলাম না। বিনা কারণে ছাত্রছাত্রীরা হঠাৎ হঠাৎ ক্লাস না করে চলে গিয়ে ক্লাস নিতে ইচ্ছুক অধ্যাপকদের অপ্রস্তুত করবে কেন ? তবে কি এরা অনেক কিছু জেনে ফেলেছে ? আসলে আমার মনে হয়, বর্তমানের ছাত্রছাত্রীরা পারি-পার্শ্বিকের প্রভাবে সহজে অনেক কিছু পেয়ে যায় বলেই প্রতিযোগিতার মানসিকতা হারিয়ে ফেলেছে। আর কলেজ বা বিভাগের সঙ্গে সম্পর্ককে কেবলই দেনাপাওনার অঙ্কে বিচার করলে কিছুতেই এর সঙ্গে একাত্ম হওয়া যায় না। কলেজের পরীক্ষায় কম নম্বর পেলে দেখি ছাত্র বা ছাত্রীরা সংশ্লিষ্ট অধ্যাপকদের এড়িয়ে চলে। আমরা কিন্তু উল্টোটাই করেছি। কারণ, ভুল না করে তো শেখা যায় না আর আমরা তো শিক্ষার্থী। তাই অনেক ক্ষেত্রেই আমার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নিজের ছাত্রজীবনের ছবিটাকে খুঁজে পেতে কষ্ট হয়। বিভাগীয় গ্রন্থাগারে পড়াশোনার ছবিও এখন বেশ ম্লান। অথচ আমাদের বিভাগীয় গ্রন্থাগার এখন পূর্ণ গবেষণা গ্রন্থাগারের সমপর্যায়ী। বিগত এক বছরের চেষ্টায় ভারত সরকারের প্রকাশন বিভাগ থেকে বহু কমিশন রিপোর্ট, আইন, সংবিধান আনানো সম্ভব হয়েছে, এগুলি আগে ছিলই না। এই ব্যাপারে আমি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ নিয়েছিলাম। এর প্রেরণাটা কিন্তু এসেছিল বিভাগের প্রতি আমার ভালোবাসা থেকেই। অনেক কথাই বললাম, যদিও মনে হয় কিছুই বলা হল না।

তবু সর্বশেষে বলি, নিষ্ঠা এবং ঐকান্তিকতায় অনেক কিছুই হয়। আমরা অধ্যাপকেরা, ছাত্রছাত্রীরা মিলে মিশে অনেক কিছু অর্জন করতে পারি। কারণ, পরবর্তী প্রজন্মের প্রতি দায়বদ্ধতা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। আমি আশাবাদী – সেদিন একদিন আসবেই কারণ "মেঘ ক্ষণিকের, চিরদিবসের সূর্য"।

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073